শোকাবহ আগস্ট ■ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাঙালির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

শেখ মুজিবের অবদান কতটুকু

(পূর্ব প্রকাশের পর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পথ-পরিক্রমায় প্রথমেই যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বঙ্গবন্ধুর সরকার তার প্রত্যেকটিকেই চূড়ান্ত বিচারে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ হিসাবে দেখা যেতে পারে। স্বাধীনতার দশ মাসের মাথায় বাংলা ভাষায় একটি চমৎকার, আধুনিক ও কার্যকর সংবিধান রচিত হল জাতির জনকের প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায়। সংবিধানকে বলা যেতে পারে মাতৃ অবকাঠামো যার আলোকে সকল আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। দেশের গৌরব শীর্ষ বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে রচিত হয়ে অনুমোদিত হল একটি বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক, দেশ ও যুগোপযোগী একীভূত ধারার এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার বিধান সম্বলিত শিক্ষানীতি-সূচিত হল মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি যার মাধ্যমে দক্ষভাবে বাস্তবায়িত হবে অর্থনীতি বিকাশের পরিকল্পনা। এভাবে রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনায় তৈরি হল নীতিমালা ও কৌশলপত্র যাতে আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় গড়ে ওঠে কল্যাণ রাষ্ট্র বাংলাদেশ-গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্রের চারটি স্তম্ভমূলে। তবে বাংলাদেশের সংবিধানে যে সমাজতন্ত্র নক্ষত্রের মতো আলো বিকিরণ করছে তা কিন্তু কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে ভিন্ন ধাঁচের। কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক দেশে সকল সম্পদ তথা উৎপাদনের সকল উপাদান থাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট ইচ্ছার প্রতিফলনে সম্পদের তিন ধরনের মালিকানা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-ব্যক্তি মালিকানা, সমবায়ী ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭২-১৯৭৬) প্রণয়ন করেন দেশের চারজন শীর্ষ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপকবৃন্দ। এ দলিলে সুস্পষ্ট মুন্সিয়ানা ও আবেগে জ্বল জ্বল করছে কল্যাণ রাষ্ট্রে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক মুক্তির সনদ যা অবশ্যই ছয় দফা ও ৭ই মার্চের ঘোষণার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার বিষয়গুলো হচ্ছে অবকাঠামো পুনর্বাসন ও নির্মাণ (বন্দর, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, সেতু কালভার্ট, স্কুল-কলেজ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ), শিক্ষা, পরিকল্পিত পরিবার সম্বলিত জনসংখ্যানীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আয় ও সুযোগ বৈষম্য হ্রাসকরণ। এখানে উল্লেখ রয়েছে যে দেশটির মালিক জনগণ যাদের অনেকেই বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত; তাদের আয়-রোজগার যেন গড় সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়। প্রয়োজন বোধে বিত্তবানদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অধিকতর জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে হবে রাষ্ট্রীয় খাতে। তবে দেশীয় উদ্যোক্তাগণকে প্রণোদনা দিয়ে শিল্প প্রসারে পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের অন্য একটি ক্ষেত্র কৃষিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিষাণ কিষাণির বিরুদ্ধে লঘু দোষে রুজু করা লক্ষাধিক সার্টিফিকেট মামলা তুলে নেয়া হয়। কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার ও কীটনাশক উচ্চমূল্যে আমদানি করে গরিব চাষি ভাইদের মধ্যে বিতরণ করা হয় প্রায় বিনামূল্যে। সাশ্রয়ী সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। গভীর নলকূপ ও হালকা নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। স্বাধীনতার শুরুতে খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্যাদির তীব্র অভাব ছিল। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের মাধ্যমে এসব আমদানির ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধু। কনজিউমার্স সাপ্লাইজ কর্পোরেশন, কসকর মাধ্যমে খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সাশ্রয়ী মূল্যে বিতরণ করা হয় সারা দেশে। বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত রেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

অর্থনীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় সর্বশেষ ঘোষণাটি আসে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সনের বক্তৃতায়। তিনি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি সমবায়ের ঘোষণা দেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের মালিকানা দলিলে অক্ষুণ্ন রেখেই সকল কৃষিভূমিকে সমবায়ের অধীনে একীভূত করে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত চাষবাসের মাধ্যমে পাঁচগুণ ফসল ফলানোর প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। জমিতে যারা শ্রম দেবে সে কৃষকরা উৎপাদনের একটি বড় অংশ পাবেন। রাষ্ট্রের কাছেও যাবে একটি অংশ। এভাবে খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য বিনির্মাণ করা হবে নিশ্চিতভাবে ও দ্রুতগতিতে। একই সাথে জাতির জনক প্রশাসনে আমূল সংস্কার এনে জেলা গভর্নর পদ্ধতিতে সকল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিকেন্দ্রীকরণ করার বিরাট পরিকল্পনার ঘোষণা করেন। শুরু হয় ১লা আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে জেলা গভর্নরদের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। সব মতামতের সমাহারে সরকার গঠন করার অভিপ্রায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল গঠন করেন। এটা যে একদলীয় শাসন তিনি তা মনে করতেন না; তার ধারণা ছিল যে এ পদ্ধতিতে সকল মত ও পথের মানুষকে এক ছায়াতলে আনা হলো। বাকশাল, ইহার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক মুক্তির প্রোগ্রাম ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন না করেও অনেকে ইহার সমালোচনা করেন।

১৫ আগস্টের বিয়োগান্ত ঘটনাবলী সংঘটিত করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মহান স্বাধীনতার চেতনাকে হত্যা করা হবে বলে যারা মনে করেছিল সেই কুচক্রীদের উদ্দেশ্য মোটেও সফল হয়নি। আজ বাংলাদেশের বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিপুল সামাজিক অগ্রগতি সারা বিশ্বে নন্দিত, প্রশংসিত। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দৃষ্টিনন্দন সাফল্য ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে বিপুল অগ্রগতি। বছরের প্রথম দিনে ৩৬ কোটি নতুন বই বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে পায় উৎসবের আমেজে। শিক্ষার হার এখন শতকরা ষাট ভাগ ছাড়িয়ে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা জনসংখ্যার প্রায় দুই শতাংশ। প্রাথমিকে এখন ভর্তির হার শতভাগের প্রায় কাছাকাছি এবং ঝরে পড়ার হার ত্রিশের কোটায়। বিদ্যুৎ সমস্যার এখন অনেকটাই সমাধান হয়ে গেছে। বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিকরা এখন এম.আর.পি নিয়ে বিদেশে ভ্রমণ করেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এখন শতকরা ৪০ ভাগ এবং গতি ঊর্ধ্বমুখী। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, সমুদ্রসীমা বিজয় আর গতিময় পররাষ্ট্রনীতিসহ একটি উদ্ভাবনী নীতিমালার সুফলে বাংলাদেশ আজ অর্থনীতির পরাশক্তিসমূহের বিশেষ সখ্যতার আহ্বান পাচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই, জাতির জনকের সম্মোহনী ক্ষমতার সমকক্ষ না হলেও নিজ সাহস, দক্ষতা ও অধিকারে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হয়েছেন শেখ হাসিনা। ১৯৬৬ সালে আইয়ুব-মোনেমের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্টদের হারিয়ে তখনকার ইডেন কলেজ তথা এখনকার বদরুন্নেসা কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বেশ দাপটের সাথেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনকের অর্থনীতির রূপরেখা অনুসরণ করেই সফলতার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তবে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত এবং অনেক দেশে সফল সমবায়ের শক্তিশালী মাধ্যমকে এখনও অর্থনীতিতে ধারণ, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়নি। বলতে দ্বিধা নেই, আজকের জটিল ও সমস্যাপ্রবণ বিশ্বে যুগের উপযোগী

অর্থনীতি ও রীতিনীতি কৌশল গ্রহণ করেছেন শেখ হাসিনা-নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বিশ্বব্যাংকের স্বীকৃতি অনুসারেই বাংলাদেশ আজ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ। বর্তমান প্রেক্ষিতে বুদ্ধিমত্তার সাথে নতুন করে প্রযুক্তি নির্ভরতায় উৎপাদনসহ সকল কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও উৎকর্ষতা আনয়নের অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা অনেকেই পথ চেয়ে-কত শীঘ্র মধ্যম মানব সম্পদ সূচকে পদার্পণ করবে কল্যাণ রাষ্ট্র বাংলাদেশ-ঘুচে যাবে দুখী মানুষের সকল অভাব, আপন মহিমায় প্রজ্বলিত হবে সোনার বাংলার সোনার মানুষ।

শেষ করার আগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথিত দুর্বলতার দিকগুলো দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করে কিছু বাস্তব তথ্য পেশ করতে চাই। তার প্রশাসনিক দক্ষতা কম ছিল বলে যে অপবাদ রয়েছে তা মেনে নেয়া যায় না। সদ্য স্বাধীন দেশে বড় ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা হতে দেন নাই তিনি। সশস্ত্র সংগ্রামে স্বাধীনতা অর্জিত অন্যান্য দেশের ন্যায় বিপুল প্রাণহানি এখানে ঘটতে দেয়নি শেখ মুজিব সরকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি কার্যকর ও সর্বজনে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থায় নিয়ে আসেন জাতির জনক।

১৮৬০ সালের পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গলে (পিআরবি) জেলা পুলিশ সুপারের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার কর্তব্য জেলা প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয় এ বিধান উঠিয়ে দিতে। তিনি রাজী হন নাই এ যুক্তিতে যে অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর নজরদারী বেসামরিক সিভিলিয়ানদের হাতে থাকাই উত্তম। মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের মধ্যে যারা সরকারি কাজে নিয়োজিত তাদের দু'বছরের অ্যান্টিডেটেড সিনিয়রিটি দিতে বঙ্গবন্ধু রাজী হননি কারণ এতে একজন মানুষের জন্মতারিখ দু'বছর আগে চলে যাবে। সৃষ্টি হতে পারে বিভেদ। তিনি বরং ভাবতে বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের কি কি উপায়ে আরো বেশি বেশি সম্মানিত ও উপকৃত করা যেতে পারে। উভয় বিষয়েই অবশ্য ১৯৭৭ সালে সরকারি আদেশ জারী হয়ে যায়।

বাংলাদেশে বিদেশি অর্থ সাহায্যের বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে গোল বাঁধে। জাতির জনক শর্ত দেন যে, বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে যে এইড কনসোর্টিয়াম হয়ে থাকে তার প্রথমটি যেন প্যারিসের বদলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংক পাল্টা শর্ত দেয় যে এর আগে পাকিস্তান সরকারের বিদেশি দায়দেনার অংশবিশেষ যেন বাংলাদেশ স্বীকার করে নেয়। বঙ্গবন্ধু পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ নেন। তবে অনড় থাকেন এ বলে যে আগে পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করুক তারপরে পূর্ব বাংলার যে সকল প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহৃত হয় সেগুলোর দায় নেয়া যেতে পারে। তবে শুধু দায় নয়, সম্পদ ও দায় বিষয় দুটো একসঙ্গে আলোচনা করা যাবে। যে কারণে বাংলাদেশের সৃষ্টি বিশ্বব্যাংক যেন আবার সেই অন্যায় চাপিয়ে না দেয়। তেয়াত্তর সনে এইড কনসোর্টিয়ামের সভা কিন্তু ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ১৯৫ জন পাকিস্তানিকে ছেড়ে দেয়া এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ব্যাপারে অন্যায্য প্রচার-প্রচারণা আজও চলছে। প্রকৃত চিত্রটি বর্ণনা করতে চাই। কোলাবরেটর আইনের অধীনে কয়েক হাজার যুদ্ধবন্দীকে গ্রেফতার করা হয়। মামলাও করা হয়। মামলায় কয়েকজনের সাজাও হয়। প্রফেসর গোলাম আজমসহ আট জনের নাগরিকত্ব বাতিল করে বঙ্গবন্ধু সরকার। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার আইন শেখ মুজিব সরকারই পাস করে। আর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণাতেই স্পষ্ট করে বলা আছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের হিংসাত্মক ঘটনায় যারা জড়িত ছিল তারা ছাড়া বাকিরা সাধারণ ক্ষমা পেতে পারে। ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর মুক্তির বিষয়ে ত্রিদেশীয় আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর সরকার এ জন্য রাজী হয় যে অন্যথায় বাংলাদেশ বিশ্বসভায় একঘরে হয়ে যেত। অনেক দেশই তখন পর্যন্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। বাংলাদেশ তখনও জাতিসংঘের সদস্য হয় নি। তাছাড়া অনেক বিশিষ্টজনসহ লক্ষাধিক বাংলাদেশি তখনও পাকিস্তানের কারাগারে; তাদের মুক্তির পথ খোলা রাখতেই হতো।

চুয়াত্তর সালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু এক রাষ্ট্রীয় সফরে ইরাক যান। সফর শেষে যে যৌথ ইশতেহার প্রকাশ করার কথা, এর খসড়া দেখে তিনি বিস্মিত। এতে উল্লেখ ছিল আরব উপসাগর। বঙ্গবন্ধু, পুরানো ম্যাপ পর্যালোচনা করতে বললেন কর্মকর্তাদের। কারণ ঐ সাগরের নাম পারস্য উপসাগর। ইরাকীরা তা মানতে চায়নি। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিত বুদ্ধির ফলে দ্য গাল্‌ফ লিখতে রাজী হলেন। সে ভাবেই যৌথ ইশতেহার প্রকাশিত হল।

বঙ্গবন্ধু সতের দিনের সফরে রাশিয়ায় যান চিকিৎসার জন্য। সফরসঙ্গী এক মিডিয়া ব্যক্তি লোভ সামলাতে না পেরে হোটেল পরিচারিকার সাথে অশোভন আচরণ করে বসেন। আমার কাছে খবর আসে ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ব্যক্তিকে দেশে পাঠানোর নির্দেশ দেন। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ যখন রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশ নিয়ে আসে তখন তিনি জানলেন যে ঐ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে; পরবর্তী ফ্লাইটে তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। ঘটনার সাথে জড়িত হোটেল পরিচারিকারও এতে কোনো ইন্ধন ছিল কিনা তা যেন তারা অবশ্যই খতিয়ে দেখেন।

শেখ কামালের কথিত ব্যাংকলুট সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর ও মিথ্যাচার করা হয়। একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে শেখ কামাল দেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকতেন। ১৯৭৪ সালের বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর রাতে সন্ত্রাসী মনে করে পুলিশের এক গাড়ির পিছনে ধাওয়া করেন। পুলিশও শেখ কামালকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে না পেরে দুষ্কৃতকারী ভেবে গুলি চালায়। আহত হন শেখ কামাল। এতে ব্যাংক ডাকাতির কোনো সম্পর্কই ছিল না।

১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারি জাতির জনক মহামান্য রাষ্ট্রপতির উত্তরা গণভবন থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকা ফিরে আসেন। ঢাকায় নামতেই তিনি অবহিত হন যে সর্বহারা নেতা সিরাজ সিকদার পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া "লোকটাকে তোরা মেরে ফেললি।" এ বিষয়ে তার যে পূর্বে কোনো ধারণাই ছিল না স্বতঃস্ফূর্ত এ বক্তব্য তারই সাক্ষ্য বহন করে। পরে সংসদে, "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার" বলে যে অভিমানী বক্তব্য দেন তার মাধ্যমে হঠকারী রাজনীতি থেকে মধ্যবিত্তদের দূরে সরে থাকার আর্তিই ফুটে ওঠে। আমার জানামতে সিরাজ সিকদারের বোন শামিম সিকদার বা তাদের পরিবারের অন্য কেউ সর্বহারা নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য কখনও জাতির জনককে দায়ী করেননি।

১৮৬৬ সনে বৃটিশ শাসকরা একটি নিবর্তনমূলক আইন "দ্য ড্রামা কন্ট্রোল অ্যাক্ট" চাপিয়ে দেয় ভারতীয়দের ওপর। আতাউর রহমান সাজু ও আলী যাকের সেই আইন অগ্রাহ্য করে এবং পাণ্ডুলিপি থানায় জমা না দিয়েই ১৯৭৪ সনের নভেম্বরে একটি নাটকের আয়োজন করে। থানার দারোগা এসে নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। পরের দিন আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জাতির জনকের সাথে দেখা করে ঐ ঔপনিবেশিক আইন বাতিলের অনুরোধ করে। রাষ্ট্রপতি তাৎক্ষণিকভাবে ঐ কালাকানুন বাতিলের আদেশ দেন ও শিল্পকলা একাডেমিকে এ বিষয়ে সকল আইনী কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে বলেন।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল তিন বছর সাত মাস চারদিন। তিনি মাঝে মধ্যে "চাটার" দলের কর্মকাণ্ডে বিব্রত ও বিরক্ত হতেন বটে। কিন্তু সে সময় কেনাকাটাসহ কোনো বিষয়েই বড় কোনো দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি। জবরদখলকারী অবৈধ মোশতাক সরকার বঙ্গবন্ধুর কথিত দুর্নীতির বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতি পায়নি তারা। কারণ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্ত সকল উপহার বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি সরকারি তোষাখানায় জমা দিয়ে দিতাম।

আজ ৪০ বছর পর জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা সবাই কি একটি দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াতে পারি না। সকল বিরোধী শক্তি কি জাতির জনককে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে তাকে উপযুক্ত সম্মানের আসনে রেখে অন্তত এই একটি ব্যাপারে একমত হতে পারি না! (সমাপ্ত)

লেখক : অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক